ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ

সাইয়্যেদ কুতুব

---

(১)

বেশ কিছু কারণে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ[1] এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো জানা জরুরি।

একজন মুসলিমের জন্য এটি জরুরি, কারণ এই ওয়ার্ল্ডভিউ থেকে সে অস্তিত্বের ব্যাপারে একটি সার্বিক ব্যাখ্যা পায়। প্রত্যেক মানুষকে স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যেকার সম্পর্কের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এই বাস্তবতাগুলোর একটা সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেয়। আর এই সর্বাঙ্গীন ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই একজন মুসলিম দুনিয়াকে এবং দুনিয়াতে নিজের অবস্থানকে বোঝে।

মহাবিশ্বে মানুষকে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান দেওয়া হয়েছে।, এই সত্যকে চেনা ও মানবজীবনের উদ্দেশ্যকে জানার জন্যও ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ প্রয়োজন। কারণ এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই মানুষ মহাবিশ্বে তার ভূমিকা, কাজের ক্ষেত্র, সীমানা এবং স্রষ্টার সাথে তার নিজের সম্পর্ককে বুঝতে শেখে।

যেকোনো ওয়ার্ল্ডভিউকে স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে মৌলিক কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। এই বিষয়গুলোই সংজ্ঞায়িত করে দেয় মানুষের জীবনযাত্রার ধরন, +ঠিক করে দেয় তা কোন ধরনের জীবনব্যবস্থার জন্ম দেবে। কাজেই জীবনব্যবস্থার ভিত্তি হলো এই সামগ্রিক ব্যাখ্যা বা ওয়ার্ল্ডভিউ। আর ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ভিত্তি গড়ে ওঠে এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপর। ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা ওয়ার্ল্ডভিউ থেকে জন্ম নেয় জোড়াতালি দেওয়া জীবনব্যবস্থা,+ অগভীর শেকড়ের গাছের মতো খুব সহজে যা ভেঙে পড়ে। যতদিন টিকে থাকে, জোড়াতালির ব্যবস্থা ততদিন জন্ম দিতে থাকে দুঃখ, কষ্ট ও দুর্দশার। কারণ এধরনের ব্যবস্থা মানুষের প্রকৃতি এবং বাস্তব চাহিদাগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক। আজকের সব জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য;+ বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে অনুসৃত তথাকথিত– 'প্রগতিশীল' জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে।[2]

দ্বীন[3] ইসলাম নাযিল হয়েছে এক বিশেষ ধরনের উম্মাহ গড়ে তোলার জন্য। এমন এক উম্মাহ, যা মানবজাতিকে আলোর পথ দেখাবে, মহান আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে পৃথিবীতে। এই উম্মাহ মানবজাতিকে মুক্ত করবে বিচ্যুতি, পথভ্রষ্টতা, কলুষিত নেতৃত্ব,- মিথ্যে আদর্শ আর মতাদর্শের কবল থেকে। মানবজাতি আজ দুর্দশাগ্রস্ত। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে একজন মুসলিম এই বিশেষ উম্মাহর অগ্রগামী সদস্যে পরিণত হয়। এমন সদস্য যে মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে, উদ্ধার করতে পারে বর্তমান অন্ধকার থেকে।

মুসলিমদের জীবনের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি ইসলামি আকীদা, ওয়ার্ল্ডভিউ এবং এগুলো থেকে গড়ে ওঠা ইসলামি জীবনব্যবস্থা। অস্তিত্বের এই সামগ্রিক ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরে কুরআন। মানবপ্রকৃতির কোনো দিক, কোনো অক্ষ সেখানে বাদ যায় না। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, ইন্দ্রিয় এবং অন্তর্দৃষ্টির মতো বিভিন্ন দিক আলোচিত হয় সেখানে। আলোচিত হয় বস্তুজগৎও। এই সব দিকগুলোর ব্যাপারে কুরআনের অবস্থান ও দিকনির্দেশনা মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ এই দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিনসমূহের মালিক, মানুষের সৃষ্টিকর্তা।

মুসলিমদের প্রথম প্রজন্ম তাঁদের জীবনকে গড়ে নিয়েছিলেন সরাসরি কুরআন থেকে নেওয়া এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের আঙ্গিকে। তাঁরা একে গ্রহণ করেছিলেন পূর্ণাঙ্গভাবে। এক্ষেত্রে তাঁরা অনন্য। তাঁদের মতো পূর্ণাঙ্গভাবে আর কোনো প্রজন্ম এই ওয়ার্ল্ডভিউকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। আল্লাহ তাঁদের পুরস্কৃত করেছিলেন, বসিয়েছিলেন মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে। মন ও মস্তিষ্ক, সমাজ ও শাসন—প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন এক ব্যবস্থা তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, যার কোনো তুলনা, যার কাছাকাছি কোনো দৃষ্টান্ত ইতিহাসে এর আগে কিংবা পরে পাওয়া যায় না। এই প্রজন্মের দিকনির্দেশনার প্রধান উৎস ছিল কুরআন। তাঁরা ছিলেন কুরআনের প্রজন্ম। রদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন, এই জাতির উদ্ভব একটি কিতাবের ভিত্তির ওপর। এই কিতাবই তাঁদের উৎস এবং উদ্দেশ্য। এই কিতাবই পথপ্রদর্শনকারী, মাপকাঠি। আর কিতাবের শিক্ষা কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, তার দৃষ্টান্ত হলো নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ। কুরআনের নির্দেশনা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের ফসল হলো সুন্নাহ। এই হলো সম্পূর্ণ পথ ও পদ্ধতি। মা আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে খুব অল্প কথায় আমাদের মা গভীর এক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন।[4]

কিন্তু পরের প্রজন্মগুলো একটু একটু করে কুরআন থেকে দূরে সরে গেল। কুরআনের ছায়াতল থেকে সরে গেল তাদের অবস্থান। বাড়ল কুরআনের পথ আর দিকনির্দেশনার সাথে দূরত্ব। কুরআন নাযিলের ফলে যে পরিবেশ, মূল্যবোধ ও পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুরআনের শিক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ইসলামের প্রথম প্রজন্ম এমন এক পরিস্থিতিতে কুরআনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, যখন তাঁরা দুনিয়ার বুকে তাওহীদের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য করছিলেন সংগ্রাম। এ পথে তাদের সহ্য করতে হয়েছিল অনেক দুঃখ, কষ্ট এবং নির্যাতন। জাহিলিয়্যাহর[5] মোকাবিলায় তাদের লড়াই করতে হয়েছিল, আত্মত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁরা বহন করছিলেন পর্বতসম এক দায়িত্ব। তীব্র পরিশ্রম ও সংগ্রামের এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে না গেলে প্রথম প্রজন্ম যেভাবে কুরআনকে বুঝেছিলেন, পুরোপুরি সেভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

কুরআনের শিক্ষার তাৎপর্য এবং মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা কুরআনের আয়াত কিংবা আয়াতের শব্দগুলোর অর্থ বোঝা নিয়ে নয়। মূল সমস্যা হলো—কুরআন নাযিল হবার সংগ্রামপূর্ণ পরিস্থিতিতে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে আয়াতগুলো শোনার সময় যে অনুভূতি, চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা অতিক্রম করেছিলেন, তা পুনর্নির্মাণের ক্ষমতা আমাদের মনের নেই। তাঁদের কুরআনের অভিজ্ঞতা আর আমাদের অভিজ্ঞতা এক নয়। তাঁদের অনুভূতি আর আমাদের

অনুভূতি আলাদা। তাই কুরআনকে তাঁরা যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছিলেন, সেভাবে আমরা করি না।

তাদের সংগ্রাম ছিল জিহাদ—ভয়ভীতি, কামনাবাসনার সাথে লড়াই এবং বাহ্যিক শত্রু সাথে লড়াই। ভয়, আশা, পরিশ্রম আর আত্মত্যাগ ছিল এই সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সংগ্রাম ছিল উত্থান-পতনের এক চক্র। এই প্রজন্ম মক্কাতে ইসলামের দাওয়াহর সূচনা দেখেছিলেন। মক্কাতেই তাঁরা সহ্য করেছিলেন কষ্ট ও নির্যাতন। তাঁরা দুর্বল এবং দরিদ্র্য ছিলেন। তাদের একঘরে করে রাখা হয়েছিল। শিআবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন তাঁরা। ক্ষুধা, ভীতি, নির্যাতন, সামাজিক বয়কট—নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁদের। এক আল্লাহর ওপর ভরসা করা ছাড়া তাঁদের করার মতো আর কিছুই ছিল না।

তারপর তাঁরা মদীনাতে গেলেন। তাঁরা ছিলেন মদীনাতে ইসলামি উম্মাহ, সমাজ ও শাসনের গোড়াপত্তনের সাক্ষী, এ প্রকল্পের সক্রিয় সদস্য। তাঁদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতা, নিফাক আর চক্রান্ত। তাঁরা দেখেছিলেন বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধ। দেখেছিলেন হুদাইবিয়া, মক্কা বিজয় আর তাবুকের দিনগুলো। তাঁরা বেঁচে ছিলেন এমন এক সময়ে, যখন ইসলামি জাতির জন্ম ও বিকাশ ঘটছিল। তাঁরা এই প্রক্রিয়ার সক্রিয় অংশ ছিলেন+ এবং এই পুরো সময় জুড়ে তাদেরকে লড়াই করতে হয়েছিল নিজেদের নফসের সাথেও।

এমন পরিস্থিতিতে কুরআন নাযিল হয়েছিল অনুপ্রেরণা ও গভীর অর্থসহ। কুরআন ছিল জীবন্ত দিকনির্দেশনা। প্রতিটি অক্ষর আর শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যকে এই মহান প্রজন্ম আত্মস্থ করেছিলেন। ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে নিঃসন্দেহে এমন পরিস্থিতি পার হতে হবে। আর তখনই কুরআন মানুষের হৃদয়ের সামনে তাঁর রহস্যগুলো প্রকাশ করবে, তাঁর সম্পদগুলো তুলে ধরবে, চারদিকে ছড়িয়ে দেবে তাঁর দিকনির্দেশনা আর আলো।

এমন পরিস্থিতিতেই মহান আল্লাহর এই বার্তাকে প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা গ্রহণ করেছিলেন,

> তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না, বরং আল্লাহ ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (সূরা হুজুরাত, 49 : 17)

এবং তাঁর এই উপদেশ আত্মস্থ করেছিলেন,

> হে মুমিনগণ!, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় করো, যা তোমাদের মধ্যকার কেবল জালিম লোকেদেরকেই আক্রমণ করবে না। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। স্মরণ করো, সে সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প।, দুনিয়াতে তোমাদেরকে দুর্বল হিসেবে গণ্য করা হতো। তোমরা আশঙ্কা করতে, লোকেরা তোমাদেরকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র রিযক দান করেছেন;+ যাতে তোমরা (তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (সূরা আনফাল, ৮ : ২৪-২৬)

তাঁরা আল্লাহর এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন,

আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করে চলো, যেন তোমরা শোকরগুজার হতে পারো। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১২৩)

তাঁরা হিকমাহর সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন,

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না, বিষণ্ন হয়ো না;- যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে। যদি তোমাদেরকে আঘাত স্পর্শ করে, অনুরূপ আঘাত তো অপর পক্ষকেও স্পর্শ করেছিল। (জয়-পরাজয়ের) এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি, যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না। এবং (এ জন্যও) যেন আল্লাহ মুমিনদেরকে সংশোধন করেন এবং নিশ্চিহ্ন করেন কাফিরদের। তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে -অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্তও পরখ করেননি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কারা ধৈর্যশীল। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৩৯-১৪২)

এবং অনুধাবন করেছিলেন এই অনুপ্রেরণার অর্থ,

অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে অবশ্যই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৮৬)

আল্লাহর এই বার্তাগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ আল্লাহ তাঁর কুরআনে এমন ঘটনার কথা বলছিলেন, যেগুলো ঘটছিল তাঁদের চোখের সামনে। যেগুলো ছিল তাদের জীবনের অংশ। সময় কিংবা স্থানের দূরত্ব ছিল না, পরিস্থিতিরও ভিন্নতা ছিল না। আজ যারা একই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব পরিপূর্ণভাবে কুরআনের অর্থ ও বার্তাকে ধারণ করা। কুরআনের ওয়ার্ল্ডভিউ এমন লোকেদের চিন্তা, অনুভূতি ও জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত হয়। তারা কুরআন থেকে এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সত্যতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। কারণ এই ওয়ার্ল্ডভিউ তাঁদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় জীবন্ত। সবকিছুকে তাঁরা এর আলোতে দেখে। তবে এমন মানুষের সংখ্যা কম।

লোকেরা আজ কুরআনের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। মানুষ আজ এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছে, যার সাথে ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের বিভিন্ন মিল পাওয়া যায়। তাই আল্লাহ, মহাবিশ্ব, মানুষ ও মানবজীবনের ব্যাপারে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষের সামনে তুলে ধরা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এটি তুলে ধরব সরাসরি কুরআন থেকে। পাশপাশি যুক্ত করব কিছু ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা। তবে আমাদের আলোচনা কোনোভাবেই কুরআনের বিকল্প হতে পারে না। বরং এই আলোচনার উদ্দেশ্য মানুষকে

কুরআনের কাছে আনা, যাতে তাঁরা নিজেরা কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে নিতে পারে এবং কুরআন থেকে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের গভীর সত্যগুলো অনুসন্ধান করতে উদ্‌বুদ্ধ হয়।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার করা দরকার। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে বোঝার এ চেষ্টার উদ্দেশ্য নিছক কেতাবি জ্ঞান অর্জন নয়। লাইব্রেরিগুলোতে 'ইসলামি চিন্তা' আর 'ইসলামি দর্শন'-এর শিরোনামে শত শত বই আছে। সেই লম্বা তালিকায় আরেকটি বই যুক্ত করার ইচ্ছে আমাদের নেই। শীতল তাত্ত্বিকতা, নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা কিংবা 'সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ' করা নিয়ে আমরা আগ্রহী নই। এধরনের তুচ্ছ এবং সস্তা আলোচনাতে সময় এবং শ্রম খরচ করার অর্থ হয় না।

আমরা জ্ঞানকে শক্তিতে পরিণত করতে চাই। এমন শক্তি, যা মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করবে পৃথিবীতে তার উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে। জ্ঞানকে অতিক্রম করার পর যে আন্দোলন তৈরি হয়, আমরা সেই আন্দোলনকে আনতে চাই। আমরা মানুষের ভেতরে ঘুমিয়ে পড়া বিবেককে জাগাতে চাই, যেন সে ওহির আলোতে নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। আমরা চাই, মানুষ তাঁর জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বুঝুক। ফিরে আসুক রবের দিকে, তাঁর নির্ধারিত পথে। আল্লাহ তাআলা বনী আদমকে সম্মানিত করেছেন। আমরা চাই, মানুষ সেই সম্মানের উপযোগী জীবনব্যবস্থায় ফিরে আসুক। যেভাবে এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে বাস্তবায়ন করেছিলেন, এর ভিত্তিতে সত্য, কল্যাণ, আদল, ইনসাফ ও ভারসাম্যের পথে এগিয়ে গোটা মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; আমরা চাই উম্মাহ আবারও সেই নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করুক।

প্রথম প্রজন্মের ওয়ার্ল্ডভিউ এবং জীবনব্যবস্থা ছিল বিশুদ্ধ। কিন্তু ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে অন্যান্য ওয়ার্ল্ডভিউ, জীবনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিমদের সংস্পর্শ আর লেনদেন বাড়ল। ইসলামি ইতিহাসের প্রথম দিক ছিল দাওয়াহ, জিহাদ এবং সংগ্রামের। সময়ের পালাবদলে সংগ্রামের বদলে এক পর্যায়ে এল সহজতা ও আরাম-আয়েশের যুগ। এছাড়া উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পর সৃষ্ট ফিতনার সময়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য ও চিন্তাধারা জন্ম নিল। এই মতপার্থক্যগুলো থেকে একসময় জন্ম নিল বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকাও।

সময় তার আপন গতিতে এগুতে থাকল। বাড়ল বিচ্যুতিও। ইসলামি ভূখণ্ডের লোকেদের অনেকে গ্রীক দর্শন আর খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন ফিরকার ধর্মতাত্ত্বিক তর্কবিতর্ক নিয়ে পড়তে শুরু করল। আকীদা নিয়ে যেসব দার্শনিক-তর্কবিতর্ক এর আগে খ্রিষ্টধর্মকে জর্জরিত করেছিল, সেগুলো এবার মুসলিম বিশ্বে আমদানি করা হলো। আব্বাসি যুগের বাগদাদে এবং উমাইয়্যাহ শাসিত আন্দালুসে এসব জল্পনাকল্পনা আর তর্ক বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই বুদ্ধিবৃত্তিক অসংযমের প্রভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন কিছু বিচ্যুতি ও প্রবণতা দেখা দিলো, যা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে একেবারেই বেমানান।

বিশুদ্ধ ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এসেছিল বিচ্যুতি, অনুমাননির্ভর দার্শনিক আলোচনা আর অনর্থক তর্কবিতর্ক থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। দার্শনিক অনুমানের বিভ্রান্তির আর জল্পনাকল্পনার মরুপ্রান্তর থেকে বের করে এনে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষের শক্তি ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছিল সত্য, ন্যায় ও বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে নির্মাণের কাজে;+ গঠনের প্রকল্পে। গন্তব্যহীন ছুটোছুটি থেকে মানুষকে রক্ষা করেছিল ইসলাম। কিন্তু একসময় ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে বিভিন্ন বিচ্যুতি এবং বিজাতীয় উপাদান যুক্ত করা হলো।

বিজাতীয় সংস্কৃতির সাথে মেলামেশার ফলে তৈরি হওয়া নানা বিচ্যুতির কারণে এক দল মুসলিম আলিম মনে করলেন, কালামশাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এসব বিপথগামিতার জবাব দেওয়া দরকার। মহান আল্লাহর সিফাত, তাঁর ইচ্ছা ও শক্তি, কুরআন, মানুষের কাজ, পুরস্কার, শাস্তি, তাওবা ইত্যাদি নিয়ে তৈরি হলো নানা ধরনের ব্যাখ্যা, যুক্তি আর বিশ্লেষণ। জন্ম নিল নানা বিতর্ক। তর্কবিতর্কগুলো খুব দ্রুত বিবাদে পরিণত হলো। জন্ম হলো খারেজি, শিয়া, মু'তাযিলা, ক্বাদারিয়া, জাবরিয়াসহ বিভিন্ন ফিরকার।

মুসলিম আলিম ও চিন্তাবিদদের অনেকের মধ্যে গ্রীক দর্শন, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের মেটাফিযিক্যাল আলোচনা নিয়ে মুগ্ধতা ছিল।[6] ভক্তিভরে অ্যারিস্টটলকে তারা 'প্রথম শিক্ষক' উপাধি দিয়েছিলেন। তারা ভেবেছিলেন, গ্রীক দর্শনের সাহায্য ছাড়া ইসলামি চিন্তা অপরিপক্ক ও অপরিপূর্ণ থেকে যাবে। তাই তারা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ওপর গ্রীক দর্শনের পোশাক চাপালেন। রচিত হলো বইয়ের পর বই। আজকের বিভিন্ন চিন্তাবিদ যেমন পশ্চিমা সভ্যতা ও চিন্তা নিয়ে মুগ্ধতাভরা ঘোরের মধ্যে থাকেন, তেমনিভাবে সেই যুগে গ্রীক চিন্তা ও দর্শন নিয়ে মুগ্ধতা ও মোহ কাজ করত। এই চিন্তাবিদরা গ্রীক দর্শনের আলোকে 'ইসলামি দর্শন' গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। আরেকদল বিভিন্ন আকীদাগত প্রশ্ন ও তর্কের নিরসনের জন্য অ্যারিস্টটলীয় যুক্তির কাঠামো অনুযায়ী গড়ে তুললেন কালামশাস্ত্র।

তারা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বিশুদ্ধ, স্বাধীন অবস্থান ত্যাগ করলেন। ইসলাম শুধু শীতল, নীরস যুক্তিতর্কের দিকে মনোযোগ দেয় না। বরং মানব অস্তিত্বের সব দিককে আমলে নেয় সামগ্রিক ও পরিপূর্ণভাবে। কিন্তু ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের স্বতন্ত্র, স্বাধীন কাঠামো গড়ে তোলার বদলে তারা একে বসাতে চাইলেন দর্শনের সীমিত ছাঁচের ভেতর। ধার করা বিভিন্ন দার্শনিক ধারণার সাথে ইসলামের সামঞ্জস্য প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তাদের শাস্ত্রের পরিভাষাগুলোও প্রায় পুরোপুরিভাবে ধার করা।

ঈমানের পদ্ধতি আর দর্শনের পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। ইসলামি আকীদা মহৎ সত্যের সন্ধান দেয়। অন্যদিকে ধর্মতাত্ত্বিক আর মেটাফিযিক্যাল আলোচনাতে থাকে কৃত্রিমতা আর বিভ্রান্তিতে ভরা তুচ্ছ কিছু কথাবার্তা। ইসলামি আকীদার সুসংহত কাঠামোর সাথে কথিত 'ইসলামি দর্শন'-এর সামঞ্জস্য ছিল না। এই 'ইসলামি দর্শন' ছিল ইসলামি বিশ্বাসের স্বচ্ছ স্রোতে দূষিত পানির মতো। এসব বুদ্ধিবৃত্তিক কারসাজি মানুষের মনে কেবল বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে, ইসলামি চিন্তার বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করেছে। এর প্রশস্ততাকে সংকীর্ণ করে একে করেছে শুষ্ক এবং দুর্বোধ্য। জন্ম দিয়েছে অনর্থক জটিলতার। ইসলামি দর্শন আর কালামশাস্ত্র পুরোপুরিভাবে বিজাতীয়, আমদানি করা। প্রথম প্রজন্ম যেভাবে ইসলামকে বুঝেছিলেন, এগুলোর ধরন, পদ্ধতি, রীতি ও শিক্ষা তার চেয়ে একেবারেই আলাদা।

কথাগুলো অনেকের কাছে বিস্ময়কর লাগতে পারে; বিশেষ করে যারা 'ইসলামি দর্শন' চর্চা করেন ও নানা দার্শনিক আলাপ-আলোচনা পছন্দ করেন, তাদের কাছে। কিন্তু ইসলামি দর্শনের লেবেল লাগানো প্রতিটি বিষয় ছুড়ে ফেলা ছাড়া, কালামশাস্ত্রের সাথে যুক্ত প্রতিটি বিষয়কে বাদ দেওয়া ছাড়া এবং বিভিন্ন ফিরকার আবিষ্কৃত নানা যুক্তিতর্ক মুছে ফেলা ছাড়া ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। এগুলো বাদ দেওয়ার পরই কেবল আমরা কুরআনের কাছে ফিরে গিয়ে সরাসরি বিশুদ্ধ ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ গ্রহণ করতে পারব। জানতে পারব এর উপাদান ও অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় অন্য ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে মিল-অমিলের আলোচনা আসতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করতে হবে সরাসরি কুরআন থেকে এবং সেভাবেই তুলে ধরতে হবে স্বতন্ত্র ও

স্বাধীনভাবে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ তুলে ধরার ব্যাপারে আমাদের পদ্ধতিকে বোঝার জন্য তিনটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে :

অধিকাংশ ফিরকার বিচ্যুতি এবং পারস্পরিক বিবাদের পেছনে গ্রীক দর্শন ও খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব থেকে আমদানি করা যুক্তি ও ধ্যানধারণার বড় ভূমিকা আছে। এসব নিয়ে বিভিন্ন ফিরকাগুলো যা কিছু লিখেছে, সেগুলোকে গ্রীক ও খ্রিষ্টানদের মূল আলোচনার ওপর ত্রুটিপূর্ণ টীকাটিপ্পনী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এসব যুক্তিতর্ক আবার নতুন করে আনার অর্থ হলো মানুষের মনে বিভ্রান্তি আর বিশৃঙ্খলা তৈরি করা,+ আর কিছু নয়।

গ্রীক দর্শন আর অ্যারিস্টটলের চিন্তাকে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা ছিল চরম মাত্রার ভুল, বোকামি। গ্রীক দর্শনের প্রকৃতি, এর পৌত্তলিক উৎস এবং এর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা ও পদ্ধতির অনুপস্থিতির ব্যাপারে গভীর অজ্ঞতার ফলেই এধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। গ্রীক দর্শনের সবগুলো বৈশিষ্ট্য ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বিপরীত।

গ্রীক দর্শনের জন্ম হয়েছিল মূর্তিপূজারী সমাজে। যে সমাজের পরতে পরতে মিশে ছিল পৌরাণিক কল্পকাহিনি আর চিন্তা। গ্রীক দর্শনের গাছ বেড়ে উঠেছিল সমাজের মধ্যে থাকা সর্বব্যাপী পৌত্তলিকতা আর গ্রীক পুরাণের নানা ধারণা শুষে নিয়ে। এর সাথে আপসহীন তাওহীদের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা করার চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে!?

খ্রিষ্টান ধর্মতাত্ত্বিকরা ব্যাপকভাবে গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। একারণেই দেখবেন -গ্রীক দর্শনের পরের দিকের অনেক ব্যাখ্যাকার ছিল খ্রিষ্টান। এই খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদদের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম দার্শনিক এবং কালামশাস্ত্রবিদদের অনেকে একসময় ধরে নিল—দার্শনিকদের (দার্শনিক মাত্রই তারা গ্রীক দার্শনিকদের বোঝাতেন) পক্ষে মুশরিক হওয়া সম্ভব নয়। আর এই ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে তারা ইসলামি আকীদার সাথে মুশরিক গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তার সমন্বয়ের অসম্ভব প্রকল্প হাতে নিলেন। ইসলামি দর্শনের বিশাল একটা অংশ জুড়ে আছে এই ধরনের নিষ্ফল প্রচেষ্টার নানা ফলাফল।

উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পর ইসলামি বিশ্ব নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। অনেকে তখন কুরআনের প্রকৃত অর্থকে বাদ দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুরআনের আয়াত ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। দর্শন ও কালামশাস্ত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন ফিরকা সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করে নিজ নিজ অবস্থানকে। এধরনের অধিকাংশ যুক্তিতর্ক ছিল একপেশে। তাছাড়া বিশুদ্ধ ইসলামি চিন্তাকে উপস্থাপনের জন্য এধরনের শাস্ত্রগুলো উপযুক্ত নয়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য আর উপাদানগুলো গ্রহণ করতে হবে সরাসরি কুরআন থেকে এবং তা করতে হবে এসব ঐতিহাসিক তর্কবিতর্কের কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে।

ইসলামের সঠিক বুঝ থেকে দর্শন আর কালামের উত্তরাধিকার সরিয়ে রাখাই উত্তম। তবে এই বিচ্যুতিগুলো নিয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন,+ যাতে করে বিভিন্ন সময়ে উম্মাহর মাঝে মাথাচাড়া দেওয়া বিচ্যুতি এবং সেগুলোর কারণ সনাক্ত করতে পারি আমরা। ফলে আগেকার ভুলগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হতে পারব, বিরত থাকতে পারব ইসলামি জীবনব্যবস্থা ও ওয়ার্ল্ডভিউয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে একই ধরনের ভুল করা থেকে।

পশ্চিমা চিন্তাধারার বিকাশ হয়েছে তার নিজস্ব পথে। প্রথমে এর ভিত্তি ছিল শিরকি ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত গ্রীক দর্শন। আধুনিক সময়ে এর ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যাথলিক চার্চ ও এর শিক্ষার বিরোধিতা। রেনেসাঁর সময় থেকেই ক্যাথলিক চার্চের বিরোধিতা পশ্চিমা চিন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হতে শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় একসময় এটি রূপান্তরিত হয় সব ধর্ম এবং ধর্মীয় মতবাদের বিরোধিতায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতবাদগুলো কখনোই নবি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রকৃত শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেনি। চার্চের প্রচারিত খ্রিষ্টবাদের জন্ম হয়েছিল শিরকি রোমান সাম্রাজ্যের ছায়ায়, যে সাম্রাজ্য খ্রিষ্টবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করেছিল স্রেফ রাজনৈতিক কারণে। এই প্রক্রিয়ার ফলে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর শিক্ষা বিকৃত হয় এবং প্রায় পুরোপুরিভাবে পালটে যায়। প্রথম দিকে এই বিকৃতি ঘটে রোমীয় পৌত্তলিকতার প্রভাবে। পরে চার্চ এবং চার্চের কাউন্সিল ওহি থেকে পাওয়া শিক্ষার সাথে যুক্ত করতে থাকে নানা বিজাতীয় ধ্যানধারণা। খ্রিষ্ট ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করা হয় রোমান সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য। ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতার বিভিন্ন দাবিদারদের দ্বন্দ্ব বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের আকীদা ও মতবাদকে চার্চের অধীনে একত্রিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টাও করা হয় এইসময়।[7] কাজেই ক্যাথলিক চার্চের তৈরি করা খ্রিষ্টবাদের সাথে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রকৃত শিক্ষার খুব কমই মিল আছে।

এভাবে ক্যাথলিক চার্চ অস্তিত্ব ও মহাবিশ্বের ব্যাপারে বিভিন্ন বিকৃত ধ্যানধারণা এবং অবস্থান গ্রহণ করল। এটা হবারই ছিল। মানবীয় সব গবেষণা এবং জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। মধ্যযুগের ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা যখন এসব ভুল সংশোধনের চেষ্টা করল, চার্চ তখন তাদের বিরুদ্ধে নিল কঠোর অবস্থান। চার্চ শুধু আদর্শিকভাবে বিরোধিতা করে ক্ষান্ত হলো না, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে বন্দি ও নির্যাতন করল ভিন্নমত পোষণকারীদের। অনেক ক্ষেত্রে হত্যাও করল।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত, ইউরোপীয় চিন্তা কেবল খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি, বরং সব ধর্ম এবং ধর্মীয় ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা এমন সব চিন্তাধারা ও ধারণা গড়ে তুলেছে, যেগুলোর অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় চিন্তার বিরোধিতা এবং স্রষ্টা ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের চিন্তাধারা মুছে ফেলার মাধ্যমে চার্চের কর্তৃত্ব নষ্ট করা। চার্চের কর্তৃত্ব সরাতে গিয়ে স্রষ্টার ধারণাকেই আসলে তারা আক্রমণ করে বসেছে। আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন দর্শন, মতবাদ এবং গবেষণা-পদ্ধতি সচেতনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে ধর্মের বিরুদ্ধে। ধর্মবিদ্বেষ গেঁথে আছে ইউরোপীয় চিন্তার কেন্দ্রে, জ্ঞানের সংজ্ঞা এবং জ্ঞানার্জনের পদ্ধতির মধ্যে।

কাজেই ইউরোপীয় চিন্তাধারা এবং এর ফসলগুলোর মধ্যে ইসলামি চিন্তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিম থেকে ধার করা ধ্যানধারনা দিয়ে ইসলামি চিন্তার পুনর্নির্মাণও সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন ইসলামি চিন্তক এধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছেন এবং সেগুলো ব্যর্থ হয়েছে। এই বইটি পড়ে শেষ করার পর পাঠকও বুঝতে পারবেন—, ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে পশ্চিমা চিন্তাধারার মিশ্রণ কেন অসম্ভব।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ, এর বৈশিষ্ট্য এবং উপাদানগুলো নিয়ে আমাদের এই গবেষণার পদ্ধতি হলো :

§ কুরআনের ছায়াতলে জীবনযাপনের পর সরাসরি কুরআন থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া।

§ কুরআন নাযিল হবার সময়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সাধ্যমতো তুলে ধরা। আসমানি দিকনির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হয়ে চিন্তার মরুপ্রান্তরের মানুষের দিকভ্রান্ত পথচলার বাস্তবতাকে বোঝা।

পূর্বনির্ধারিত কোনো ধ্যানধারনা কিংবা মাপকাঠি নিয়ে আমরা কুরআনের কাছে যাব না। বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে ধার করা নতুন কিংবা পুরনো বুদ্ধিবৃত্তিক, যৌক্তিক বা আবেগ-অনুভূতিজাত মাপকাঠি দিয়ে আমরা মাপব না কুরআনকে। আগে থেকে ঠিক করা ধ্যানধারণার ছাঁচে কুরআনকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টাও আমরা করব না।

মানবজাতির জন্য আল্লাহ যেসব বিধিবিধান পছন্দ করেছেন, মানুষের ওয়ার্ল্ডভিউ ও জীবনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে যে মানদণ্ডকে তিনি নির্ধারণ করেছেন, কুরআন এসেছে সেটি প্রতিষ্ঠার জন্য। মহান আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি কুরআনের দিকনির্দেশনা পাঠিয়েছেন তাঁর পক্ষ থেকে রাহমাহ এবং নিয়ামাত হিসেবে। আমাদের দায়িত্ব হলো সব দূষিত এবং বহিরাগত উপাদান ছুড়ে ফেলে এই নিয়ামাতকে কৃতজ্ঞতা ভরে বিশুদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করা। এভাবে গ্রহণ করলেই আগেকার কলুষিত ধ্যানধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ধ্বংসাবশেষ থেকে এবং মানুষের এলোমেলো অনুমানের গোলকধাঁধা থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণভাবে স্রষ্টার দিকনির্দেশনা মেনে চলা সম্ভব।

আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রে কি অন্য কোনো পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ড থাকতে পারে? শুরু থেকেই আমাদের ধারণা এবং মাপকাঠির ভিত্তি হবে কুরআন। কুরআনকে বোঝা এবং কুরআন থেকে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ, এর বৈশিষ্ট্য এবং উপাদানগুলো আহরণের এটাই একমাত্র সঠিক পদ্ধতি।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য আমরা দর্শনের কাঠামো ধার করতে চাই না। কারণ বিষয়বস্তু আর উপস্থাপনার ধরনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। উপস্থাপনার কারণে বিষয়বস্তু প্রভাবিত হয়। কোনো বিষয়কে বিরোধী কোনো কাঠামোর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে তার প্রকৃতি ও শিক্ষা বিকৃত হয়ে যায়। তাই ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে দর্শনের আঙ্গিকে উপস্থাপন করা যাবে না। দর্শনের কাঠামো ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে কেবল বিকৃত করবে। কারণ দর্শনের কাঠামোর প্রকৃতি এবং ক্রমবিকাশ ইসলামের সাথে একেবারেই বেমানান, অনেক ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক। এটি সুবিদিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়। যে একবার ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে অনুধাবন করতে পেরেছে, সে এর সত্যতা এবং সৌন্দর্যকে কেবল কুরআনের মহিমান্বিত আঙ্গিকে উপভোগ করবে।

কবি ইকবাল ইসলামকে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন দার্শনিক হেগেলের ভাববাদ (idealism)-এর দার্শনিক কাঠামো ধার করে। তাঁর এই পদ্ধতির সাথে আমরা একমত নই।[8]

মানুষকে সম্বোধন এবং আহ্বান করার ক্ষেত্রে ইসলামি আকীদার নিজস্ব পন্থা আছে, এর বৈশিষ্ট্য সজীবতা ও সামঞ্জস্য, যা সরাসরি মানুষের ফিতরাহকে আকৃষ্ট করে। এটি মানুষের অন্তরে এমনসব গভীর সত্যের উপলব্ধি তৈরি করে, যা পুরোপুরিভাবে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শব্দেরা কেবল সেই মহান সত্যের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। কুরআনের উপস্থাপনা শুধু মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে আকৃষ্ট করে না। বরং তা মানবপ্রকৃতির সব দিককে আকৃষ্ট করে।

কিন্তু দর্শনের রীতিই আলাদা। এটি শব্দ ও বাক্যের এক নির্দিষ্ট কাঠামোর ভেতর বাস্তবতাকে ধরতে চায়। কিন্তু বাস্তবতার এমন

অনেক দিক আছে, শব্দ ও বাক্যের ঠাসবুননে যা কখনোই পুরোপুরিভাবে ধরা দেয় না। বাস্তবতার এমন কিছু দিক আছে, মানবীয় চিন্তা দিয়ে যেগুলোর নাগাল পাওয়া যায় না। মানুষের চিন্তা আর বুদ্ধির সীমাকে সেগুলো অতিক্রম করে যায়। একারণেই দর্শন অযথাই জটিল, শুষ্ক এবং প্রাণহীন।

তাছাড়া, দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা কখনোই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেনি। অন্যদিকে, ধর্মীয় বিশ্বাস বরাবরই মানুষকে কাজে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। সময়ের ঊষর প্রান্তর আর পথের অন্ধকার উপেক্ষা করে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। কিন্তু দর্শন কখনোই তা করতে পারেনি।

যেকোনো আকীদাকে তার নিজস্ব ধাঁচে উপস্থাপন করা উচিত। দর্শনের আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে গেলে এর অর্থ মরে যায়, নিভে যায় আলো ও অনুপ্রেরণা। আকীদার বহুমুখী তাৎপর্য ও শিক্ষাকে দর্শন সীমাবদ্ধ করে ফেলে একটি নির্দিষ্ট, সংকীর্ণ দিকে। যখনই কোনো বিশ্বাসকাঠামোকে অপর কোনো কাঠামোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়, সংকীর্ণ কোনো ছাঁচের মধ্যে জোর করে বসানোর চেষ্টা করা হয়, তখনই সেই বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটে। বিচ্যুতি ঘটে। বিশ্বাসের প্রাণবন্ততা পরিণত হয় শুষ্কতায়।

আমরা ইসলামি চিন্তার ক্ষেত্রে ‘ইসলামি দর্শন’-এর অধ্যায় চাই না। ইসলামি চিন্তার ব্যাখ্যার জন্য ইসলামি দর্শনের প্রয়োজন নেই। ইসলাম কিংবা ইসলামি চিন্তায় এমন কোনো ত্রুটি বা কমতি নেই, যা পূরণের জন্য দর্শনের কাছে যেতে হবে। এটি ইসলামের বিশুদ্ধতা, শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ।

আমাদের পদ্ধতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—এ পদ্ধতি গঠনমূলক। নির্দিষ্ট কোনো বিচ্যুতি নিয়ে লম্বাচওড়া আলোচনা বা খণ্ডনের দিকে আমরা মনোযোগ দেবো না। কোনো নির্দিষ্ট বিচ্যুতির খণ্ডন কিংবা সংশোধনের জন্য আমরা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ নিয়ে আলোচনা করছি না। বরং ইসলামের সত্য এসেছে পরিপূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে। এই সত্যগুলো মহাবিশ্ব ও প্রাণিজগতের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ। আর এভাবেই আমরা এ সত্যগুলো তুলে ধরতে চাই।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে কোনো নির্দিষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতির খণ্ডন বা জবাব হিসেবে উপস্থাপন করার মধ্যে বেশ কিছু সমস্যা আছে। এটি একটি বিপজ্জনক পদ্ধতি। এতে করে এক দিকের বিচ্যুতি দূর করতে গিয়ে বিপরীত দিকে প্রান্তিক অবস্থান এবং নতুন বিচ্যুতি তৈরি হবার আশঙ্কা থাকে। প্রাচ্যবিদ কিংবা নাস্তিকদের জবাব দিতে গিয়ে ইসলামের শিক্ষার ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া এবং নতুন বিচ্যুতিতে পতিত হবার বেশ অনেকগুলো উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে।[9] নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে মাথাচাড়া দেওয়া বিচ্যুতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে লেখা অনেক রচনাতেও এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

খ্রিষ্টান মিশনারি এবং যায়নবাদীদের অনেকে অভিযোগ করে, ইসলাম তলোয়ারের ধর্ম। ইসলামের প্রসার হয়েছে তরবারির মাধ্যমে। অনেকে তাদের এই অভিযোগের জবাব দিতে দাঁড়িয়ে যান। ব্যস্তসমস্ত হয়ে চেষ্টা করেন ইসলামের ওপর থেকে এই ‘কালো দাগ’ মুছে ফেলার। কিন্তু তাড়াহুড়ো এবং জোশের কারণে দেখা যায়—ইসলামে জিহাদের অবস্থানকে তারা ছোট করে দেখাচ্ছেন। জিহাদের সংজ্ঞাকে সীমিত করে ফেলছেন। নানা কৈফিয়তমূলক কথাবার্তা এনে বলছেন, ইসলামে জিহাদ শুধু রক্ষণাত্মক। আবার তারা রক্ষণাত্মক শব্দটিও গ্রহণ করছেন এর আধুনিক, সীমিত অর্থে।

তারা ভুলে যান যে, ইসলাম হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরো মানবজাতির জন্য দিকনির্দেশনা, আল্লাহর নির্ধারিত একমাত্র দ্বীন, চূড়ান্ত দ্বীন। মানবজাতির কল্যাণে সারা পৃথিবীজুড়ে নিজস্ব জীবনব্যবস্থা কায়েম করার অধিকার ইসলামের আছে। যাতে পুরো মানবজাতির মধ্যে ন্যায়, ইনসাফ, আদল ও মানবিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং ইসলামি ব্যবস্থার অধীনে ইসলামের শর্ত মেনে বসবাস করতে পারে প্রত্যেকে। এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা মুসলিমদের দায়িত্ব। মানবজাতির কল্যাণে ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লড়াইকেই বলা হয় জিহাদ। ইসলামি জীবনব্যবস্থার উদ্দেশ্য সব মানুষের আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার সংরক্ষণ করা। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন যথোপযুক্ত সমাজ, আইন ও শাসনব্যবস্থা। আর সেই ব্যবস্থার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লড়াই-ই হলো জিহাদ। অথচ ইসলামের সমর্থনে বলতে গিয়ে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কমিয়ে দেখানো হয় এর গুরুত্ব।

এ তো কেবল একটি উদাহরণ। খণ্ডন ও কৈফিয়তমূলক আলোচনায় এমন আরও অনেক ত্রুটি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এধরনের আলোচনা নতুন নতুন বিচ্যুতির জন্ম দেয়।

একইভাবে ইসলামি শারীআ এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির ভূমিকা কী—এ তর্কে অনেকেই প্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ করেন। এক পক্ষের কথা খণ্ডন করতে গিয়ে আরেক পক্ষ চলে যান বিপরীত চরম অবস্থানে। ইসলাম মানবীয় বুদ্ধিমত্তাকে নাকচ করে না। বুদ্ধিমত্তাই মানুষকে ওহি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সৃষ্টির মাঝে থাকা নানা নিদর্শনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ বারবার মানুষকে চিন্তা করতে বলেছেন কুরআনে। বুদ্ধির কাজ হলো ওহিকে গ্রহণ করা, এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করা, নিজের সীমার ভেতরে যা আছে, তা অনুধাবন করা। আর যা তার নাগালের বাইরে, তা সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া। বুদ্ধির কাজ এটুকু। কিন্তু বুদ্ধি কখনো চূড়ান্ত বিচারক হতে পারে না।[10] যেখানে কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বক্তব্য আছে, সেখানে সোজাসাপ্টা প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করতে হবে। কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ সেখানে নেই। কুরআনের বক্তব্য অবিসংবাদিত। বুদ্ধিমত্তা বা আক্বলের দায়িত্ব হলো কুরআন থেকে পাওয়া সোজাসাপ্টা অর্থের ভিত্তিতে নিজের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে নেওয়া। দৈনন্দিন জীবনে কুরআন থেকে পাওয়া মাপকাঠি এবং শিক্ষা প্রয়োগ করা। সামনে এ বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করা হবে।

ইসলামের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে, এর সমর্থনে যারা কাজ করেছেন, তাদের ভুল ধরা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু সতর্ক করতে চাই—বিচ্যুতির খণ্ডনে অতি-উৎসাহ অনেক সময় নতুন বিচ্যুতির জন্ম দেয়। তাই ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ উপস্থাপনের সময় ওহির শিক্ষা ও নিজস্বতা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে এর সামগ্রিক রূপটি উপস্থাপন করাই উত্তম।

এটি দর্শন, ধর্মতত্ত্ব কিংবা মেটাফিযিক্সের কোনো বই নয়। এই বই বাস্তবতা নিয়ে। বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান নিয়ে।

দর্শন আর মিথ্যা দ্বীনের ভ্রান্ত ধ্যানধারণার স্তূপের নিচে মানবজাতি যখন হাহাকার করছিল, বিভ্রান্তের মতো মানুষ যখন ছুটে মরছিল মানবীয় জল্পনাকল্পনা আর অনুমানের গোলকধাঁধায়, তখন ইসলাম এসেছিল মানুষকে সেই আবর্জনার স্তূপ থেকে মুক্ত করতে। ইসলাম এসেছিল এক অনন্য ও বিশুদ্ধ ওয়ার্ল্ডভিউ নিয়ে। মানবজাতিকে ইসলাম উপহার দিয়েছিল এক নতুন জীবন, আল্লাহর নির্ধারিত এক নতুন জীবনব্যবস্থা। কিন্তু আজ আলো ছেড়ে মানুষ আবারও ফিরে গেছে সেই আবর্জনার স্তূপ আর গোলকধাঁধার ভেতরে।

ইসলাম এসেছিল এক নতুন উম্মাহর সূচনা করতে। সেই উম্মাহকে আল্লাহ মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিলেন। অজ্ঞানতা আর অন্ধকারের মরুপ্রান্তর থেকে মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল সেই উম্মাহ। মুসলিম উম্মাহ, আমাদের উম্মাহ। কিন্তু সেই উম্মাহ আজ নিজের নেতৃত্বের দায়িত্ব ভুলে গেছে। আজ তারা ওই সব জাতির অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে গেছে, যারা নিজেরাই বিভ্রান্ত, আকণ্ঠ আবর্জনায় নিমজ্জিত।

এই বইটি ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো সংজ্ঞায়িত করার একটি প্রচেষ্টা, +যাতে এ ওয়ার্ল্ডভিউয়ের আলোকে আমরা বুঝতে পারি;—-মহান আল্লাহর আমাদের জন্য কেমন জীবন চান। একই সাথে ইসলামের এই সর্বাঙ্গীন ব্যাখ্যা থেকে চিন্তা, জ্ঞান ও সভ্যতাসহ সব মানবীয় উদ্যোগের ব্যাপারে দিকনির্দেশনাও যেন আমরা পাই। ইসলামি ব্যবস্থা ও সভ্যতার মূল ভিত্তি হতে হবে সঠিক ইসলামি চিন্তাধারা। মন ও মস্তিষ্ক, উম্মাহ এবং মানবজাতি—সব ক্ষেত্রে এবং সবার এই চিন্তাধারা প্রয়োজন।

আল্লাহই হিদায়াতকারী এবং সাহায্যকারী।

(২)

আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রঙের দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর? (সূরা বাকারা, ২ : ১৩৮)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য সবকিছু থেকে একে আলাদা করে দেয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে দেয় এক স্বতন্ত্র রূপ। আর এ কারণেই অন্য কোনোকিছুর সাথে মিশ্রিত করা হলে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের স্বকীয়তা হারিয়ে যায়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের এই বৈশিষ্ট্যগুলো সংখ্যায় অনেক, তবে এর সবগুলো মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত, আর তা হলো এর ঐশ্বরিক উৎস।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এসেছে সমস্ত সৃষ্টির রবের কাছ থেকে, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। এর সব উপাদান ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। সত্তাগতভাবেই এটি অপরিবর্তনীয়। এই ওয়ার্ল্ডভিউ বদলায় না, মানুষের অধিকার নেই এতে সংযোজন বা বিয়োজন করার। মানুষের দায়িত্ব÷ পরিপূর্ণভাবে একে গ্রহণ করে নিজেকে এর ছাঁচে বদলে নেওয়া এবং এর শিক্ষা প্রয়োগ করে জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া।

ইসলামের কাঠামো প্রশস্ত। এ কাঠামো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে তা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে আবার দিতে পারে বিকাশের প্রশস্ততাও।

মানুষের তৈরি ওয়ার্ল্ডভিউ, ধর্ম আর জীবনব্যবস্থাগুলো ক্রমাগত বদলায়। ওগুলো বদলাতে বাধ্য। মানুষের যখন চাহিদা বাড়ে, যখন তার প্রয়োজনের ধরন বদলায়, এই কাঠামোগুলো তখন তার কাছে সংকীর্ণ বলে মনে হয়। সে হাঁসফাঁস করতে থাকে। তখন নানা নিয়মনীতি বদলাতে হয়, অনেক সময় বদলে ফেলতে হয় পুরো ওয়ার্ল্ডভিউ, ধর্ম বা জীবনব্যবস্থাকেই। মানুষের সৃষ্টি সীমাবদ্ধ। মানুষের বানানো জীবনব্যবস্থা কিংবা ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি, সময়, স্থান আর জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মাথায় রেখে। এই সংকীর্ণতা আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় মানুষের অজ্ঞতা, ত্রুটি, সংস্কার আর আবেগ-অনুভূতির কারণে। পরের প্রজন্মগুলোর কাছে আগেকার প্রজন্মের গড়ে তোলা ওয়ার্ল্ডভিউ, ধর্ম এবং জীবনব্যবস্থাকে মনে হয় ত্রুটিপূর্ণ আর অপ্রাসঙ্গিক। তাই

হালনাগাদ আর পরিবর্তনের ধারা ক্রমাগত চলতেই থাকে। অবস্থা এবং চাহিদার পরিবর্তনের সাথে মানুষের সৃষ্টি খাপ খাওয়াতে পারে না, কারণ এগুলো আসমানি দিকনির্দেশনা থেকে বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ আলাদা। প্রকৃতিগতভাবেই এখানে পরিবর্তন কিংবা সংস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই। যিনি এটি তৈরি করেছেন, তিনি সব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত; সব অজ্ঞতা, ত্রুটি এবং অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে, তিনি মুক্ত সব সংস্কার এবং স্বার্থপরতা থেকে। স্থান ও কাল দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ নন। এই ওয়ার্ল্ডভিউকে তিনি তৈরি করেছেন সব যুগ, অবস্থা আর মানুষের জন্য। এই কাঠামো কখনোই সংকীর্ণ হয়ে আসে না।

মহাবিশ্বের একটি বৈশিষ্ট্য হলো গতিশীলতা। মানবজীবনের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মানবজীবন মহাবিশ্বেরই অংশ। তবে এই গতিশীলতা অনিয়ন্ত্রিত নয়। সুসংহতভাবে টিকে থাকতে হলে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। মানুষের জীবনকে মহাকাশের গ্রহগুলোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। গ্রহ তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হলে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় তৈরি হয়। একইভাবে মানবজীবনের যদি কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র, অক্ষ আর কক্ষপথ না থাকে, তাহলে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। মহান আল্লাহর নাযিল করা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ সূর্যের মতো, যাকে কেন্দ্র করে মানবজীবন আবর্তিত হয়। এই কক্ষপথের ভেতরে মানবজাতি চালিয়ে যেতে পারে তার বিকাশ, অগ্রগতি ও উন্নতি।

ইসলাম পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত। বাইরে থেকে খুচরো কোনো উপাদান কিংবা যন্ত্রাংশ আমদানি করার প্রয়োজন হয় না ইসলামের। তাছাড়া এটি যেহেতু আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, তাই অন্য উৎস থেকে আসা কোনোকিছুই এর সাথে খাপ খাবে না। নিখুঁত ও পরিপূর্ণ এই কাঠামোর মধ্যে নতুন কিছু যুক্ত করা বা এতে কোনো 'সংশোধন' আনার সক্ষমতা মানুষের নেই। এই ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষের কাছে এসেছে নিয়ামাত হিসেবে। এটি এসেছে তার অন্তর, বুদ্ধিমত্তা, জীবন ও পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করতে। এই ওয়ার্ল্ডভিউ এমনভাবে তৈরি হয়েছে, যাতে তা মানুষের ভেতরে থাকা সম্ভাবনা আর ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলে; যাতে সেগুলো নষ্ট না হয় নিষ্ফল লক্ষ্যের পেছনে; যাতে আসমানি নির্দেশনা অনুযায়ী সেগুলোকে গঠনমূলকভাবে কাজে লাগানো যায়। এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণের জন্য বাইরে থেকে কিছু ধার করতে হয় না। প্রয়োজন হয় না অন্য কোনো চিন্তা, দর্শন বা পদ্ধতির। নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সব উপাদান তার নিজের মধ্যেই আছে। আর সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে এমন এক জীবনব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা মহাবিশ্ব এবং মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের গতি মহাবিশ্বের গতির সাথে সাংঘর্ষিক হয় না।

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো, আরও আনুগত্য করো তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনে থাকো। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৯)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে মানবরচিত কোনো মতবাদ কিংবা ধর্মের মতো করে দেখা গুরুতর ভুল। মানবরচিত মতাদর্শ বা ধর্মের ক্ষেত্রে নানা উৎস থেকে নানা উপাদান গ্রহণ করে সমসাময়িক চিন্তাধারার আলোকে সেগুলোকে এক সাথে মেশানোর সুযোগ থাকে। সুযোগ থাকে সংযোজন, বিয়োজন এবং সম্পাদনার। কিন্তু ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ক্ষেত্রে এমন কিছুর প্রশ্নই আসে না। এই ওয়ার্ল্ডভিউ সামগ্রিক, নিখুঁত, পরিপূর্ণ।

বইয়ের আলোচনা অগ্রসর হবার সাথে সাথে এ বিষয়টি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে। আপাতত এটুকু বলা যথেষ্ট—ইসলাম নিয়ে যেকোনো গবেষণায়; সেটা ইসলামি চিন্তা নিয়ে হোক বা ইসলামি পদ্ধতি ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ঐশ্বরিক উৎসের বিষয়টি গ্রহণ করতে হবে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে। কারণ এখানেই অন্য ওয়ার্ল্ডভিউগুলোর সাথে আমাদের রাস্তা আলাদা হয়ে যায়।

[1] ওয়ার্ল্ডভিউ (worldview) : মূল আরবিতে সাইয়্যিদ কুতুব তাসাওউর (اَلتَّصَـوُّرُ الْإِسْـلَامِيُّ) ব্যবহার করেছেন। সাধারণত তাসাওউর শব্দের অর্থ করা হয় 'concept'/'conception' বা ধারণ হিসেবে। তবে লেখক এ শব্দটিকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি ইসলামি তাসাওউর বলতে বুঝিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া অস্তিত্বের সামগ্রিক ব্যাখ্যাকে। যে ব্যাখ্যার মধ্যে স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ, মানুষের উৎস ও ভূমিকা, জীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, সমাজ, শাসন—সবই অন্তর্ভুক্ত। লেখক যে অর্থে তাসাওউর শব্দটি ব্যবহার করেছেন অর্থের দিক থেকে 'ধারণা', 'দৃষ্টিভঙ্গি' ইত্যাদি শব্দের তুলনায় ইংরেজি ওয়ার্ল্ডভিউ (worldview) শব্দটি তার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। দুঃখজনকভাবে ওয়ার্ল্ডভিউ শব্দের যেসব বাংলা করা হয়েছে, সেগুলো হয় অত্যন্ত অপ্রচলিত হবার কারণে অচেনা প্রায়, অথবা মূলভাব প্রকাশে ব্যর্থ কিংবা দুটোই। তাই অনুবাদে 'ওয়ার্ল্ডভিউ' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। সংক্ষেপে ওয়ার্ল্ডভিউ হলো :

স্রষ্টা, মহাবিশ্ব, মানুষ, ইতিহাস, জীবনমৃত্যু, জ্ঞানসহ নানা বিষয়ে মৌলিক বিশ্বাসের সমষ্টি। –এটি চিন্তার ওই কাঠামো, যার সাপেক্ষে, যার মাধ্যমে এবং যার ভেতরে মানুষ বাস্তবতাকে বোঝার ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। ওয়ার্ল্ডভিউ হলো ওই লেন্স, ওই চশমা, যার ভেতর দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি। প্রত্যেকের যেমন নিজস্ব ভাষা থাকে, তেমনিভাবে প্রত্যেকের একটা ওয়ার্ল্ডভিউ থাকে। হয়তো তারা সেটাকে 'ওয়ার্ল্ডভিউ'-এর মতো গালভরা কোনো শব্দ হিসেবে চেনে না, কিন্তু শব্দের পেছনের জিনিসটা কমবেশি সবার মধ্যেই থাকে। (অনুবাদক)

[2] এই লেখকের আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হাদারা (اَلْإِسْـلَامُ وَمُشْـكِلَـاتُ الْحَضَـارَةِ) এবং অ্যালেক্সিস কারেলের Man the Unknown—বই দুটি দ্রষ্টব্য।

[3] আরবি দ্বীন শব্দটিকে সাধারণত অনুবাদ করা হয় ধর্ম বা religion হিসেবে। কিন্তু এ দুটো শব্দই মূলত ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান বোঝায়। দ্বীন শব্দটির অর্থ আরও ব্যাপক। দ্বীনের ভেতর মানবজীবনের সব দিক অন্তর্ভুক্ত।

[4] মুসলিম, ৭৪৬।

[5] শাব্দিকভাবে 'জাহিলিয়্যাহ' এসেছে (اَلْجَهْـــلُ) থেকে, যার অর্থ ইলমহীন অবস্থা বা অজ্ঞতা। ইসলামি ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাবপূর্ব সময়কালকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যাহ বা অজ্ঞতার যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এই সময়কালের সাথে বর্তমানের মৌলিক পার্থক্য আছে। বর্তমানে মহান আল্লাহর নাযিককৃত দ্বীন ইসলাম আমাদের সামনে আছে, যা ওই সময়ে ছিল না। তবে এই বিশেষ অর্থে ছাড়াও জাহিলিয়্যাহ একটি নির্দিষ্ট অবস্থা বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : কোনো সমাজ বা সভ্যতা আল্লাহর দ্বীন ও বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কিছু গ্রহণ করাকে ইসলামের বদলে জাহিলিয়্যাহকে গ্রহণ করে নেওয়া বলা যেতে পারে। সাইয়্যিদ কুতুবের নিজের উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন,

‘জাহিলিয়্যাহ ইতিহাসের কোনো নির্দিষ্ট যুগের নাম নয়, বরং এটা একটা অবস্থার নাম। সমাজে বা রাষ্ট্রে এর বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেলেই তাকে জাহিলিয়্যাহ বলা যাবে। জাহিলিয়্যাহর মূল উপাদান হলো জীবনযাপনের জন্য আল্লাহর বিধান ও শারীআকে উপেক্ষা করে মানুষের আইন, খেয়ালখুশি এবং মানুষের শাসনের আনুগত্য করা;+ চাই তা কোনো ব্যক্তি, শ্রেণি জাতি বা নির্দিষ্ট সময়কার গোটা মানব প্রজন্মের হোক না কেন। আল্লাহর আইন ও শারীআর বাইরে যা কিছু আছে, তা মানুষের খেয়ালখুশি ছাড়া আর কিছু নয়।’ সূত্র : ফী যিলালিল কুরআন, সাইয়্যিদ কুতুব, সূরা মায়িদার ৫০ নম্বর আয়াতের আলোচনা থেকে। (অনুবাদক)

[6] মেটাফিযিক্যাল (metaphysical) : মেটাফিযিক্স সম্বন্ধীয়। মেটাফিযিক্স (metaphysics)-এর বাংলা করা হয় অধিবিদ্যা। এটি দর্শনের ওই শাখা, যা প্রাথমিক মূলনীতিসমূহ (first principles) এবং সত্তা, অস্তিত্ব, জ্ঞান, পরিচয়, মন, সময়, বস্তু, ~~সময়~~, স্থান, সম্ভাবনা-এর মতো বিভিন্ন বিমূর্ত ধারণা নিয়ে আলোচনা করে। (অনুবাদক)

[7] টি ডব্লিউ আর্নল্ড, The Preaching of Islam, পৃষ্ঠা ৫৩।

[8] মুহাম্মাদ ইকবাল (মৃত্যু. ১৯৩৮), উপমহাদেশের বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক। সাইয়্যিদ কুতুব এখানে ইকবালের বই (প্রকাশিত ১৯৩০) The Reconstruction of Religious Thought in Islam-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইকবালের এই রচনায় দার্শনিক হেগেলের চিন্তার প্রভাব নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। হেগেলের দর্শন নিয়ে আলোচনা পরের অধ্যায়গুলোতে আসছে। (অনুবাদক)

[9] নাস্তিক, ইসলামবিদ্বেষী ও লিবারেল-সেক্যুলারদের উত্থাপিত অভিযোগ ও সংশয়ের জবাব দিতে গিয়ে ইসলামের বিভিন্ন অবস্থান ও বিধিবিধানের অপব্যাখ্যার প্রবণতা আজও দেশবিদেশের অনেক জনপ্রিয় বক্তা, লেখকের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। (অনুবাদক)

[10] এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন—‘সত্যের উৎস’ শিরোনামের অধ্যায়।